শরৎচন্দ্রের মহেশ গল্প : নির্যাতিত মুসলমানদের কথা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের একজন অমর কথাশিল্পী। ১৫ সেপ্টেম্বর তার ১৪১তম জন্মবার্ষিকী। ১৮৭৬ সালে তিনি হুগলি জেলার দেবানন্দনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার শৈশব ও প্রথম জীবন কাটে ভাগলপুরে মাতুলালয়ে। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি হুগলি হাইস্কুল ও ভাগলপুরে দুর্গাচরণ এমই স্কুলে অধ্যয়ন করেন। টিএন জুবিলি কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রাস (১৮৯৪) পাসের পর একই কলেজে এফএ শ্রেণীতে ভর্তি হন। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে তার শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটে।

শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস বড়দিদি ১৯০৭ প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাহিত্য জগতে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এরপর তিনি একে একে বিন্দুর ছেলে অনন্যা ১৯১৪, পরিণীতা (১৯১৪), পল্লী সমাজ ১৯১৬, দেবদাস ১৯১৭, চরিত্রহীন ১৯১৭, নিষ্কৃতি ১৯১৭, শ্রীকান্ত ৪ খণ্ড, গৃহদাহ ১৯২০, দেনা পাওনা ১৯২৩, পথের দাবি ১৯২৬, শেষ প্রশ্ন ১৯৩১, নারীর মূল্য ১৯২৩ এগুলোর মধ্যে শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, গৃহদাহ, দেবদাস ও পথের দাবি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে।

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাজাত্য অবিচ্ছেদ্য। জীবনের অভিজ্ঞতা তার সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। বলিষ্ঠ আদর্শবান অনুসরণ চরিত্র চিত্রণ শরৎ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। জীবনে চলার পথে বহু মানুষকে তিনি শুধু চোখ দিয়ে দেখেননি, প্রাণ দিয়ে দেখেছেন, ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে, মায়া আর মমতার দর্পণে দেখেছেন। এই দেখা যেসব চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন তা থেকে যেমন জীবন্ত,

শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস বড়দিদি ১৯০৭ প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাহিত্য জগতে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এরপর তিনি একে একে বিন্দুর ছেলে অনন্যা ১৯১৪, পরিণীতা (১৯১৪), পল্লী সমাজ ১৯১৬, দেবদাস ১৯১৭, চরিত্রহীন ১৯১৭, নিষ্কৃতি ১৯১৭, শ্রীকান্ত ৪ খণ্ড, গৃহদাহ ১৯২০, দেনা পাওনা ১৯২৩, পথের দাবি ১৯২৬, শেষ প্রশ্ন ১৯৩১, নারীর মূল্য ১৯২৩ এগুলোর মধ্যে শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, গৃহদাহ, দেবদাস ও পথের দাবি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাজাত্য অবিচ্ছেদ্য। জীবনের অভিজ্ঞতা তার সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। বলিষ্ঠ আদর্শবান অনুসরণ চরিত্র চিত্রণ শরৎ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। জীবনে চলার পথে বহু মানুষকে তিনি শুধু চোখ দিয়ে দেখেননি, প্রাণ দিয়ে দেখেছেন, ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে, মায়া আর মমতার দর্পণে দেখেছেন। এই দেখা যেসব চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন তা থেকে যেমন জীবন্ত, তেমনি প্রাণস্পর্শী। তার প্রতিটি লেখা যেন প্রাণের রঙে চিত্রিত। শরৎচন্দ্র বলেছেন, মানুষের মৃত্যু আমাকে ততখানি আঘাত দেয় না, যতখানি মনুষ্যত্বের মৃত্যু দেয়।

ছিঁড়ে মাঝে মাঝে পালিয়ে যায়। একজন প্রতিবেশী তাকে খড়ে দিলো। জরিমানা দিয়ে গফুর তাকে ছাড়িয়ে আনল। গফুর মহেশকে বিক্রি করে দিতে চাইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্রেতাদের তাড়িয়ে দিলো। গফুরের দু'বেলা খাবার জোটে না। উপুষ-কাপষে তার দিন কাটে। একদিন মজুরি খাটতে যেয়ে কাজ না পেয়ে গফুরও ফিরে আসল। ভাতের ব্যবস্থা না থাকায় গফুর রেগে গিয়ে আমিনাকে বকাবকি করল ও তার গালে চড় লাগিয়ে দিলো। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে পানি আনতে গেল। জমিদারের পেয়াদারা গফুরকে ধরে নিয়ে গেল। প্রচণ্ড মারধর খেয়ে সেখান থেকে ফিরে গফুর বিছানায় শুয়ে পড়ল। এমন সময় একটি আত্মচিৎকার তার কানে এলো। বেরিয়ে এসে গফুর দেখল আমিনার পানি ভরা কলস মহেষ গুঁতো মেরে ভেঙে দিয়েছে। আর মাটি থেকে ষাঁড় পানি চুষে নিচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে গফুর জ্ঞানশূন্য হলো। লাঙলের মাথা দিয়ে মহেষের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করল। সে আঘাতে মহেষ পড়ে গেল ও তার মৃত্যু হলো। আমিনা মহেষের মৃত্যুতে কেঁদে উঠল। সেই রাতেই গফুর গৃহত্যাগ করল। সে ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে যাবে। মেয়ে আমিনার হাত ধরে মহেষের শোকে সে হু হু করে কেঁদে উঠল। গফুর সৃষ্টিকর্তার কাছে বিচার দিয়ে বলল হে সৃষ্টিকর্তা তোমার দেওয়া পানি যারা মহেষকে খেতে দেয়নি তারা কশুর। বিধাতা যেন তাদের কখনো ক্ষমা না করেন।' এখানে সে যে সামাজিক নিপীড়ন এবং একটি মুসলিম পরিবার এ নিপীড়নের শিকার একথা পরিষ্কার বোঝা যায়। এটাও নির্যাতন যা

তাঁর উপন্যাসের মূল বিষয় পল্লীজীবন ও সমাজ, ব্যক্তি মানুষের মন, পল্লী সংস্কারাচ্ছন্ন, মানসিকতার আঘাতে কতটা রক্তাক্ত হতে পারে তারই রূপচিত্র এঁকেছেন তিনি তার রচনায়। মুসলমান সমাজের প্রতি তার গভীর মমতাবোধ ও শ্রদ্ধা তুলনাহীন।

তার কালজয়ী ছোটগল্প মহেশ (১৯২৬), এ গল্পে একটি নির্যাতিত মুসিলম পরিবারের কথা উঠে এসেছে। লেখক তার শুরুতে এইভাবে বিবরণ দিয়েছেন- 'গ্রামের নাম কাশিপুর, ইহার সীমানার ধারে গফুর মিয়ার বাড়ি। পূজা সেরে তর্করতœ দুপুর বেলায় বাড়ি ফিরছিলেন। পথের ধারে পিটালি গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে তর্করত্ন উচ্চ কণ্ঠে ডাক দিলেন ওরে গফুর বলি ঘরে আছিস। তার ১০ বছরের মেয়ে আমিনা দুয়ারে দাঁড়িয়ে সাড়া দিলো কেন বাবাকে? বাবার যে জ্বর। ডেকে দে তাকে। হাঁক ডাকে গফুর ঘর হইতে বের হয়ে জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে কাছে এসে দাঁড়াইল। একটা পুরনো বাবলা গাছের ডালে বাঁধা একটি ষাঁড়। তর্করত্ন দেখে কহিলেন এটা হচ্ছে কি শুনি, এ হিন্দুর গাঁ ব্র্াহ্মণ, জমিদার সে খেয়াল আছে। তার মুখখানা রাগে রক্তবর্ণ। সে মুখ দিয়ে তপ্ত কথা বাহির করতে লাগল। কিন্তু হেতুটা বুঝতে না পেরে গফুর শুধু চাহিয়া রহিল। অন্য দিকে, মহেশকে নিয়ে জ্বালাতনের শেষ নেয়। দড়ি

শরতের গল্পে ঠাঁই পেয়েছে। ঋষি অরবিন্দু বলছিলেন, মহেষ গল্পে গফুর ও আমিনার দুঃসহময় কাহিনী যেভাবে শরৎ বাবু অঙ্কন করেছেন এই জন্য তাকে নোবেল পুরস্কার দেয়া উচিত ছিল। শরৎচন্দ্রের কাহিনী নির্মাণে অসামান্য কুশলতা এবং শৈল্পিক, অতি প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষা তার কথা সাহিত্যে জনপ্রিয়তা ও খ্যাতির প্রধান কারণ। বিভিন্ন ভাষায় তার অনেক উপন্যাস চিত্রনাট্য নির্মিত হয়েছে। সেগুলো অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। সাহিত্য কর্মে অসাধারণ অবদানের জন্য শরৎচন্দ্র কুন্তলীন ১৯০৩, জগধাত্রিনী স্বর্ণপদক ১৯২৩, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৯৩৪, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিলিট উপাধি ১৯৩৬ লাভ করেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাস্তব অভিজ্ঞতার ছাকুনিতে ফেলে নিপুণ কলমের আচড়ে মমতার রস ঢেলে সেই চিত্র অঙ্কন করেছেন। নিজেকে উপস্থাপন করেছেন একজন যোগ্য শিল্পীর মতো। তাই সময়ের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে আজো বাংলা সাহিত্যে চিরসবুজ একটি নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মহেশ।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই কথা শিল্পী আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিয়েছেন ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি। তার বয়স হয়েছিল ৬১ বছর ৪ মাস।